‘তুমি ভালো থাকো প্রিয় দেশ!’

তসলিমা নাসরিন

প্রতিবেশীদের ভালবাসতে হবে, তাদেরই সবচেয়ে আপন মানুষ হিসেবে মানতে হবে– প্রায় সব ধর্মই এমন কথা বলছে। অতি ধার্মিক মানুষও ঈশ্বরের আদেশ সবসময় পালন করতে পারেনি। প্রতিবেশীর সঙ্গে মনে যদি না মেলে, তবে কি ঈশ্বরের আদেশ বলেই তা মাথা পেতে বরণ করতে হবে? মনের কোনও দাম নেই?

প্রতিবেশী এমন এক জিনিস, যাদের না হলে আমাদের চলে না, আবার হলেও ঝামেলা। বিপদে আপদে তারা সহায় হয়, আবার ব্যক্তিগত বিষয়আশয়ে তাদের নাকগলানোটা সীমা ছাড়িয়ে যায়। যত যাই বলি, মানুষের তবু মানুষ প্রয়োজন। ধুধু কোনও জনমনুষ্যহীন এলাকায় কেউ কি বাস করতে চায়? মনে না মিলুক, রুচি আদর্শে যোজন দুরত্ব থাকুক, তারপরও মানুষ মানুষের আশপাশেই বাস করে স্বস্তি পায়। প্রতিবেশী অনেক রকম, কারও সঙ্গে তুমুল ঝগড়া, মুখ দেখাদেখি বন্ধ, আবার কারও প্রেমে কেউ দেওয়ানা। আমাদের কালে যে মেয়েটিকে বা ছেলেটিকে দেখা যেত পাশের বাড়ির জানালায় বা ছাদে, তার প্রেমে পড়ারই রেওয়াজ ছিল।

প্রতিবেশী সে যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক, আপাদমস্তক নাস্তিক হোক, ভিন্ন ভাষার হোক, ভিন্ন বর্ণের হোক, সে প্রতিবেশী। বুদ্ধি হলে এই বিভেদগুলো কেউ মানে না। বুদ্ধি হওয়ার আগ অবধি বিভেদ নিয়ে সহিংস হয়ে ওঠে। মনের মিল হওয়ার জন্য ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন বর্ণ কোনও বাধা কখনই নয়। নিজের গোত্রের মানুষ যদি ভিন্ন মন-মানসিকতার হয়, তবে তার সঙ্গে গোত্র বলেই মিলতে হবে, আজ এ কথা কজন মানবে! মন জিনিসটা সবার প্রথম। একে বাদ দিয়ে সম্পর্ক করতে গেলে সম্পর্ক বেশি দিন টেকে না। কেউ অবশ্য আপস করে করে সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। মাথা নাড়ে সবার বেলায়। এরা চরিত্র ব্যক্তিত্ব সব বিসর্জন দিয়ে সহাবস্থান করবে বলেই সহাবস্থান করে। আমার আবার মনের মিল না হলে হয় না।

আমার প্রতিবেশীদের কারও সঙ্গে আমার খুব বেশি আলাপ নেই। অনেকের নাম জানি না, মুখ চিনি না। বেশিরভাগের সঙ্গেই সম্ভাষণের ঈষৎ হাসি, অথবা কী কেমন আছেন, ভালো তো? সম্পর্ক। আগ বাড়িয়ে ভাব করতে গেলে কী না কী বিপদ ঘটে কে জানে। আমাকে তো কেউ এখানে আর এখানকার মানুষ বলে ভাবে না, ভাবে বিদেশি। ভাবে মুসলমান। এই যে আপাদমস্তক ধর্মহীন মানুষ আমি, তারপরও যেহেতু

আমার নামটি হিন্দু নাম নয়, তাই আমাকে মুসলমান বলেই অধিকাংশ বোধবুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে। এই শহরকে এত ভালবেসেও এই শহর আমার শহর হয়ে ওঠে না। যাদের সঙ্গে এর মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, তারাও বিশ্বাস করে, আমি এই শহরে বা এই ভারতবর্ষে ক্ষণিকের অতিথি। অনেকে আমার সাময়িক বাসের অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞেস করে। ছ মাস বাড়ানো হয়েছে অনুমতি। আগস্টের সতের তারিখ মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আমার আবেদন যদি মঞ্জুর না হয়? মঞ্জুর না হলে এ দেশ ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে শোনার পরও কারও মুখে কোনও উদ্বেগ আমি দেখি না। প্রতিবাদের ভাষা তো কারও মুখে ফোটেই না। আমার চলে যাওয়ার আগের দিন জুৎসই একটা ফেয়ারওয়েল দেয়ার পরিকল্পনাও হয়তো মনে মনে করে। আমাকে যে তারা ভালবাসে না, তা নয়। তবে আমার স্থায়ী বাসের অনুমতি বা নাগরিকত্ব না পাওয়া সম্পূর্ণ রাজনীতির ব্যাপার এবং সরকারি ব্যাপার এবং আমার কপাল বা ভাগ্যের ব্যাপার বলেই তারা অনুমান করে এবং অনুত্তেজিত থাকে।

ভারতে থাকার অনুমতি না পেলে আমি কোথায় যাব, আমি জানি না। দুরে কোথাও কোনও বরফের দেশে আবারও আমাকে আশ্রয় খুঁজতে হবে– এরকম ভাবা আর মৃত্যুর কথা ভাবা আমার কাছে অনেকটা একই রকম। আমি তো আর একটি দেশে ফিরতে পারতাম, যে দেশটি এখন আমার প্রতিবেশী দেশ! কিন্ত ফিরব কী করে, সে দেশে আর যে-কারওরই অধিকার থাকুক পা দেবার, আমার নেই। আমি যেন দেশটির ভীষণ শত্রু, আমার জন্য দরজা চিরকালের মতো বন্ধ। মানবতার কথা বলা বা সমানাধিকারের দাবি করাকে তো অন্যায় হিসেবে জানি না কোনও দিন। শাসকের চোখে, কট্টরপন্থী, সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধদের চোখে তা ভীষণ অন্যায়। আমাকে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়েছে সেই কবে, যুগ পেরিয়ে গেল। যাবজ্জীবনেরও তো একটা শেষ থাকে। আমার এই দণ্ডের কোনও শেষ নেই। সম্ভব মৃত্যু ছাড়া এই নির্বাসন থেকে মুক্তি নেই আমার।

প্রতিবেশী দেশটির দিকে উদাস তাকিয়ে থাকি, সামনে কাঁটা তার। মেঘ উড়ে যায় পশ্চিম থেকে পুবে। মনে মনে তাকে ক ফোঁটা চোখের জল দিয়ে দিই, যেন কোনও এক গোলপুকুরপাড়ের বাড়ির টিনের চালে বৃষ্টি হয়ে ঝরে। পাখিরা পাখা মেলছে, পুবের দিকে যাচ্ছে। মানুষ হয়েছি বলে যত বাধা, তার চেয়ে পাখি হওয়াই হয়তো ভালো। কোনও সীমানা মানার দায় নেই। কোনও পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা নেই। নাগরিকত্বের বালাই নেই।

তুমি আর আমার অন্তরে নেই। তুমি অন্তর থেকে বাইরে। তোমার এখন বাইরে বাস। বাইরে বসবাস। কে যেন এরকম বলে যায় আর জাগরণের মাঝখানে স্পর্শ করলে মিলিয়ে যাওয়া তুলোর মতো সময়টায়। যেখানে আমার জন্ম, আর বড় হওয়া, যেখানে অন্তর আমার, সেখান থেকে আচমকা ছিটকে দুর দুরান্তে ভেসেছি। এখন সে দুরান্ত হতে বাংলায় ফিরেছি। বাংলা তো একই ছিল। অথচ বাংলা নিজেরই নিজের প্রতিবেশি এখন। যদি বাংলা অখণ্ড থেকে যেত, তাহলে নিশ্চয়ই নির্বাসন দণ্ড হত না আমার। তাহলে নিজেকেই নিজের প্রতিবেশী হতে হত না। দেশটি নিজের, অথচ নিজের নয়। নিজের হলে কি দরজায় কড়া নাড়তে হয় বারো বছর? নিজের দেশটি এখন প্রতিবেশী, কিন্ত ঠিক প্রতিবেশীও নয়। প্রতিবেশী হলে কেউ না কেউ এসে দরজা খুলে দিত। এ কথা মানি না যে কেউ আমাকে চায় না। যারা চায়, তারা কেন খুলছে না? এই প্রশ্ন আমার অনেক বছরের। অদ্ভুত জীবন আমার! নিজ দেশের প্রতিবেশী, আবার প্রতিবেশীরও প্রতিবেশি। দেশ তবে কোথায় আমার? আমি জানি, দেশ জানে, আমার অন্তরে সে দেশ।

আমি কেবল নিজেরই প্রতিবেশী! আমার বাবা মা, ভাই বোন, আত্মীয় বন্ধু সবারই প্রতিবেশী। দীর্ঘকাল তো ছিলাম বিদেশ বিভূঁয়ে, আতলান্তিকের ওই পারে, দেশ থেকে সহস্র মাইল দুরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবু এই ভালো প্রতিবেশী হয়েছি নিজের দেশের। তবে এইটুকু স্বস্তি তো পাই, দেশটি আছে,

কাছে আছে, পাশেই আছে। দেশটির নিঃশ্বাস শুনতে পাই। দেশটির ঘ্রাণ পাই। সবাই ঘুমিয়ে গেলে, আমিও কি নৈঃশব্দের মতো জেগে কাটাই না রাতের পর রাত! আমার মাকে আমি স্পর্শ করতে পারছি না, অথচ যেন তার শিয়রে বসে আছি। মার খুব কাছে যেতে এখন না হয় পারছি না, কিন্ত যে কোনও সময় হয়তো সেই সময়টি আসবে যে সময়টিকে আমি নির্বিঘ্নে নিয়ে যাব তার কাছে, উঠোন পেরিয়ে ঘরে উঠব, আমার জন্ম জন্ম চেনা ঘরে– এরকম একটি স্বপ্ন আমাকে ভীষণভাবে জীবন্ত রাখে। এটি কম কিছু! বেঁচে থাকতে সে সময়টি আমার জীবনে আদৌ আসবে কি? ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটাই আমি। স্মৃতির ছুরি এসে রক্তাক্ত করে আমাকে প্রতিদিন। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়, প্রায় এমন দুরত্বে আমার ইস্কুলের বন্ধুরা। আমার কলেজ, কলেজ–ক্যান্টিন, করিডোর। আমার ডাক্তার বন্ধুরা। কবি বন্ধুরা। এমন দুরত্বে আমার মামাখালারা, জন্ম থেকে চেনা আমার স্বজন, আমার ভিটেমাটি, আমার বাড়িঘর, আমার কড়ইতলা, আমার ব্রহ্মপুত্র। আমার লেখার ঘর। একত্রিশ বছর যাপন করা দীর্ঘ একটি জীবন। আমার সুখ আমার দুঃখ। আমার প্রতিবাদ। ধর্মহীন কুসংস্কারহীন বৈষম্যহীন সুস্থ সুন্দর একটি সমাজের জন্য আমার আপসহীন লড়াই করার সেই জীবন। হাত বাড়িয়ে আছি, কিন্ত ছুঁতে আমি কাউকে পাচ্ছি না। সকলে আমার প্রতিবেশী, গাছগুলো, বাড়িগুলো, মানুষগুলো, ভালবাসাগুলো। কাউকেই স্পর্শ করার ক্ষমতা নেই আমার। মাঝখানে শক্ত দেয়াল। দেয়াল যদি ইট পাথরের হত, ভাঙা যেত। দেয়াল তো ধর্মের, রাজনীতির, দুর্নীতির, হিংসের, জেহাদের। এই দেয়ালের গায়ে আমি আঁচড় কাটতে পারি, কিন্ত ভাঙার সাধ্য তো আমার নেই। আমি সামান্য মানুষ। লেখালেখি করি। বাঁচার জন্য লিখি, অথবা লেখার জন্য বাঁচি।

দেশ না হয় প্রতিবেশী হয়ে উঠল, প্রতিবেশী কি দেশ হয়ে উঠেছে, উঠবে? না সে সম্ভাবনা নেই। সব দেশেই আমি পরবাসী। নিজের দেশেও পরবাসীর মতো বাস করতে হয়েছিল। পরবাসেও পরবাসী। আর এ দেশে প্রতি মুহূর্তেই আমারই ভাষায় কথা বলা, দেখতে আমারই মতো, আমার সংস্কৃতির মানুষই আচার আচরণে বুঝিয়ে দেয় আমি তাদের কেউ নই, আমি আলাদা, আমি একা আপন করতে চাইলেই কি আপন করতে পারব।

চাইলে কি আপন করতে পারব!
দেখা হতেই পরিচিতজনরা জিজ্ঞেস করে, কলকাতায় কবে এসেছ?
আমি তো থাকি কলকাতায়। আমার উত্তর।
তা, আমাদের কলকাতা কেমন লাগছে তোমার?
হেসে বলি, খুব ভালো।
এবার কদিন আছ?
অপ্রস্ত হই, বলি, এ শহরে বাস করি আমি। আমার বাড়িঘর আছে, ঠিকানা আছে।
থাকবে তো কিছুদিন?
আমি তো থাকছিই।
যাচ্ছ কবে?
যাচ্ছি না।
ও।

আমার কথা শুনে কেউ খুব একটা খুশি হয় না। হঠাৎ হঠাৎ আমি তাদের কলকাতায়, তাদের দেশে আসব অতিথির মতো, গুণগান গাইব সবার, শেকড় গাড়তে চাইব, কিন্ত গড়ব না, এরকম হলেই যেন ভালো। থেকে গেলে আর দাম থাকে না। যতক্ষণ অতিথি, ততক্ষণই আদর। দুরে কোথাও থাকব, খুব দুরে, অচেনা কোনও দেশে, সে যেমনই থাকি। যখন বেড়াতে আসব, হই রই করে ঘিরে ধরবে সবাই। আর যখনই বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি, যারা ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারাই মুখ ফিরিয়ে রাখছে, আগ্রহ

হারাচ্ছে। কম কম দেখা হলে অকুণ্ঠ প্রশংসা শহরময় হেঁটে বেড়ালে কানে কানে নিন্দে। থেকে যাওয়া মানুষটি, যতই সে উদার হোক, আন্তরিক হোক, সৎ ও নিষ্ঠ হোক, পছন্দের মানুষ নয় আর। হবে কেন! মনে হয় যেন পাশের বাড়ির কেউ।

একটি মানুষ, যার নিজের কোনও দেশ নেই, শুধু সেই জানে সে কেমন করে বাঁচে। হারিয়েছি নিজের দেশ, সাজানো ঘর দুয়োর, শখের বাগান, হারিয়েছি বন্ধুস্বজন, হারিয়েছি যা ছিল সব। কেঁদেছি অনেক। এখন আর কান্না আসে না। হারাতে হারাতে আমি হারিয়েছি হারাবার সব বেদনাকে। দেশ নেই বলে পৃথিবীটাই আমার দেশ, এরকম কথা বলে এক ধরনের সান্ত্ব-না পাই। আবার এরকমও বলি, সত্যিই অনুভব করি বলেই বলি, যে, দেশ বলে কিছু থাকতে নেই কারও, মানুষের হৃদয়ই হতে পারে এক একটি নিরাপদ স্বদেশ। মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ন কণ্ঠে বলি, দেশ মানে যদি নিরাপত্তা, তবে নারীর নিজের কোনও দেশ নেই। কারণ জগতের কোথাও নারীর নিরাপত্তা নেই। যদি আমার কথা বলি, কোনও অর্থেই আমার কোনও দেশ নেই। নারীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি বলে নেই, নারী বলে নেই। দেশের কথা ভাবলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। ধনেখালি শাড়ি পরা মা, ভালবেসে নিঃস্ব হওয়া মা, নির্যাতিতা মা, অবজ্ঞা অবহেলা পেয়ে জীবন পার করা মা। প্রতিদিনই আমার প্রিয় স্বপ্নটি দেখি, দেখি যে আমি দেশে ফিরেছি, মা আমাকে কাছে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর কাঁদছেন। মুখে তুলে খাওয়াচ্ছেন। সামান্য চোখের আড়াল করছেন না। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন, গল্প শুনতে শুনতে, কত যে গল্প জমে আছে মার, ঘুমিয়ে যাচ্ছি। আহা, মাকে কত দিন দেখি না।কত সহস্র বছর মার সঙ্গে দেখা হয় না আমার। উড়োজাহাজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে তো মার অসুখ করেছিল। আকাশে উড়োজাহাজ দেখলেই মার মনে হত, এই বুঝি আমি এলাম। প্রতিদিন মনে হত মার। আমার দুঃখিনী মার। আর সবাই দুরে ঠেলে দিলেও মা কোনও দিনও আমাকে দুরে ঠেলেনি, সবাই ভুলে গেলেও মা ভোলেনি, কেউ না ভালবাসলেও মা বেসেছে। মার মতো বড় আশ্রয় আমার কোনওদিনই কিছু ছিল না। এখন, মা আর দেশ কেমন যেন একাকার হয়ে গেছে। মা নেই, মাকে যেমন আর মা মা বলে জড়িয়ে ধরতে পারব না এ জীবনে, দেশও তেমন। মার মতো দেশটিও হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার খুব কাছে ওরা, তারপরই টের পাই ওরা আসলে লক্ষ যোজন দুরে।

দেশে দেশে আমি ভেদ মানি না, ভাগ মানি না। নিজেকে পৃথিবীর সন্তান ভাবি। কিন্ত আমার মতো করে তো অন্যরা ভাবছে না! নিজেদের একটি গণ্ডির মধ্যে বন্দি রাখতে তাদের ভালো লাগে। আমার ভুবন যত বিস্তৃত হয়, দেশ বলে বা প্রতিবেশী দেশ বলে কিছু আমার থাকে না। একবার যদি পাখির চোখে তাকাই, সবকিছুকে কেমন ক্ষুদ্র মনে হয়। উঁচু উঁচু দালানগুলো ক্ষুদ্র, মানুষগুলো ক্ষুদ্র, কলকারখানাগুলো ক্ষুদ্র, ধর্মের মিনারগুলো ক্ষুদ্র, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিজেই তো কত ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণের জন্য, যে কোনও দিন যেটি ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে, ভীষণ ছিঁড়ে খাওয়া, বীভৎসতা। দেশ বলে কিছুই না থাকল, প্রতিবেশি-দেশ বলেও কিছু না থাকল, আমার নিজের বলে কিছুই না হয় না-ই রইল। তাতে আমার দুঃখ নেই। পৃথিবীর এখানে ওখানে মনে মেলে এমন কিছু বন্ধু থাকলেই জীবন চমৎকার কেটে যাবে। আমি না হয় পরবাসী হয়েই সবখানে রইলাম। পৃথিবীতে সবারই কি আর মাটি জোটে, সবারই কি আর মা বেঁচে থাকে!

সৌজন্যঃ আমাদের সময়